দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (The Causes of the Second World War) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীর ওপর যে ভার্সাইয়ের সন্ধি চাপিয়ে দেয় তা জার্মানী স্বীকার করতে রাজী ছিল না। জার্মান জাতীয়তাবাদী নেতারা মনে করতেন যে, এই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর ওপর ঘোর অবিচার করা হয়। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীকে চিরতরে পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জার্মান জাতির এই মানসিকতা হেতু ভার্সাই সন্ধি ভাঙার প্রবণতা দেখা দেয়। জার্মান জাতীয়তাবাদী দলগুলি জার্মান জাতিকে বোঝায় যে, ভার্সাই সন্ধি না ভাঙলে জার্মানীর সমস্যার সমাধান হবে না এবং জার্মানীর প্রকৃত মুক্তি আসবে না। এই ভার্সাই বিরোধী প্রচার ও মানসিকতা জার্মান জাতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে ঠেলে নিয়ে যায়।

ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন জার্মানীকে দ্রুত যুদ্ধের পথে ঠেলে দেয়। ভাইমার প্রজাতন্ত্রই ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করে এবং ভাইমার পার্লামেন্টে এই সন্ধি অনুমোদিত হয়। ভাইমার সরকার এই সন্ধির সংশোধন চাইলেও তাঁরা পুরোপুরি সন্ধি ভেঙে, বল প্রয়োগের নীতি থেকে দূরে থাকেন। এই প্রজাতন্ত্র ছিল সহনশীল ও শান্তিবাদী। নাৎসী দল এই প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখল করায় যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটেনি। ফরাসী মন্ত্রী রেমন্ড পয়েনকারীর ক্রুর ও প্রতিশোধমূলক নীতি এই প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা সৃষ্টি করে। ফ্রান্স ভুলে যায় যে, ভাইমার প্রজাতন্ত্রের স্থলে ভার্সাই বিরোধী নাৎসীরা ক্ষমতায় এলে সন্ধি ভেঙে পড়বে, যুদ্ধ বেধে যাবে। ফরাসী সরকারের অদূরদর্শী নীতিও ভার্সাইবাদী ভাইমার সরকারের পতনের জন্যে দায়ী ছিল।

নাৎসী নেতা হিটলার ছিলেন ভার্সাই সন্ধির তীব্র বিরোধী। তিনি ১৯৩৩ খ্রীঃ জার্মানীর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন ক্রুর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায়নীতিকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে তিনি এমন তীব্র প্রচার চালান যে, বিশ্বের জনমত এই সন্ধির বিরুদ্ধে যায়। এই সুযোগে ভার্সাই সন্ধির অবিচারমূলক শর্তগুলি ভাঙার ছলে তিনি ইওরোপের শক্তিসাম্য ভেঙে জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ থেকে তিনি জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা শুরু করেন।

হিটলারের ভার্সাই সন্ধির বিরোধিতা

নাৎসী জার্মানীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কেবলমাত্র ভার্সাই সন্ধির জার্মানীর প্রতি অবিচারমূলক শর্তগুলিকে পরিবর্তন করা ছিল না। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ হতে এটা স্পষ্ট হয়

যে, হিটলারের বৈদেশিক নীতির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধি ভেঙে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সামরিক দিক থেকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করা। তারপর পূর্ব ইওরোপে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন করা।[১] উইনষ্টন চার্চিল তাঁর গ্যাদারিং ষ্টর্ম (Gathering Storm) গ্রন্থে বলেছেন যে, হিটলারের লক্ষ্য ছিল ইওরোপে জার্মান আধিপত্য স্থাপন এবং ইওরোপের প্রধান শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা। কাজেই হিটলার ইওরোপের শান্তি ও স্থিতাবস্থাকে ভেঙে যুদ্ধের পথ প্রস্তুত করেন।

হিটলারের আগ্রাসী নীতি

এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন বর্জন করেন। হিটলার জার্মানীর এমন বিরাট অস্ত্রসজ্জা করেন যে, ইওরোপের যে কোন শক্তি জার্মানীর তুলনায় নগণ্য ছিল। তিনি সেন্ট জার্মেইন সন্ধি ভেঙে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। পূর্ব ইওরোপে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করেন। অবশেষে তিনি ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড আক্রমণ করেন। সুতরাং নাৎসী আগ্রাসনের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় এতে সন্দেহ নেই।

হিটলার কর্তৃক আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ

হিটলার তাঁর কূটনীতির দ্বারা ইওরোপের প্রধান বিরোধী শক্তিগুলিকে বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এজন্য তাঁর কূটনীতিকে 'পাশবিক' (Brutal diplomacy) আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি যখন কোন দেশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতেন তিনি মনে মনে জানতেন যে, দরকার হলে এই সন্ধি তিনি ভেঙে ফেলবেন। ফলে অপর স্বাক্ষরকারী তাঁর ওপর আস্থা স্থাপন করে বিপদগ্রস্ত হত। উদাহরণস্বরূপ পোল-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, মিউনিখ্ চুক্তি ও রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির কথা বলা যায়। এই চুক্তিগুলি হিটলার সম্পাদন করেন। পরে সুবিধাজনক সময়ে সন্ধিগুলি ভেঙে ফেলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর সম্ভাব্য শত্রুরাষ্ট্রগুলি যাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারে এজন্য তিনি কূটনীতির দ্বারা তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতেন। তিনি রুশ সাম্যবাদের প্রতি তীব্র বিরোধিতা দেখিয়ে কমিউনিষ্ট বিদ্রোহের ভয়ে ভীত ইংলন্ডকে নিজ পক্ষে আনেন, পরে তিনি ইংলন্ড ও ফ্রান্সকেই আক্রমণ করেন। তিনি রুশ-জার্মান চুক্তির দ্বারা রাশিয়াকে নিরপেক্ষ রাখেন। ১৯৪১ খ্রীঃ পশ্চিমের যুদ্ধ শেষ হলে, তিনি রাশিয়াকে আক্রমণ করেন। এইভাবে তাঁর মারাত্মক কূটনীতির দ্বারা হিটলার ইওরোপের শক্তিসাম্য ধ্বংস করেন।

হিটলারের কূটনীতি ঃ শক্তিসাম্য ধ্বংস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধার জন্যে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতি কম দায়ী ছিল না। ব্রিটেনের টোরী মন্ত্রীসভা মনে করত যে, রুশ সাম্যবাদের লাল বন্যাকে রোধ করার জন্যে নাৎসী জার্মানীকে ব্যবহার করা দরকার। জার্মানী দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়লে পূর্ব ইওরোপ থেকে রুশী সাম্যবাদ অবাধে জার্মানীর পথে পশ্চিমে ঢুকে পড়বে। এর ফলে পশ্চিমের বুর্জোয়া গণতন্ত্রগুলি ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং চেম্বারলেইন জার্মান তোষণ নীতির দ্বারা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানীর ন্যায্য জাতীয়তাবাদী দাবীগুলি পূরণের নীতি নেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নাৎসী জার্মানীর শক্তি ও অস্ত্র বৃদ্ধিতে বাধা দেয়নি। নাৎসী জার্মানী ভার্সাই সন্ধি ভেঙে একের পর এক রাজ্য দখল করলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন নিশ্চেষ্ট থাকেন। জার্মান-বিরোধী জোট গঠনের জন্যে ইংলন্ডের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন দিলে চেম্বারলেইন তা নাকচ করেন। অবশেষে সুদেতেন অঞ্চলে জার্মানীর যুদ্ধের হুমকির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া যুক্ত বাধা দানের চেষ্টা করলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তা ব্যাহত করেন। তিনি মিউনিখ্ চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সুদেতেন অঞ্চল ছেড়ে দেন। এই তোষণ নীতি নাৎসী জার্মানীকে সাহসী এবং আত্মম্ভরী করে তোলে। চার্চিল

ব্রিটেনের তোষণ নীতি

এবং বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ১৯৩৬ খ্রীঃ হিটলার রাইনল্যান্ড দখল করলে, সন্ধি ভাঙার জন্যে যদি এই সময় ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তি জার্মানীকে আক্রমণ করে শাস্তি দিত, তবে পরে জার্মানী এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেত না। কারণ তখনও পর্যন্ত জার্মানী অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিল না। অন্ততঃপক্ষে ১৯৩৮ খ্রীঃ চার্চিলের দাবী অনুযায়ী ত্রিশক্তি (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) একযোগে সুদেতেন জেলা উপলক্ষে জার্মানীকে আঘাত করলে ফল ভাল হত। কিন্তু নেভিল চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতিই জার্মানীকে আগ্রাসী হতে সাহস যোগায়।

ব্রিটিশ সরকার তাঁর বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্যে লীগের আদর্শকে অগ্রাহ্য করে জাপান, ইতালীকেও তোষণ করে। জাপান ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে, জাপানের দ্বারা দূর প্রাচ্যে রুশ শক্তি জব্দ হবে, এই বিশ্বাসে ব্রিটেন নিশ্চেষ্ট থাকে। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, জাপানকে মাঞ্চুরিয়া দখল করতে দিলে, দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশে জাপান হস্তক্ষেপ করবে না। ইতালী ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনীয়া আক্রমণ করলে ফ্রাঙ্কো-ব্রিটিশ শক্তি ইতালীর আগ্রাসনকে পরোক্ষ সমর্থন জানায়। ইতালীর বিরুদ্ধে লীগের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে অকার্যকরী করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হোর-লাভাল গোপন চুক্তির দ্বারা আবিসিনীয়া ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ইতালীর সাম্রাজ্যবাদকে প্রশমিত করার কলঙ্কজনক চেষ্টা করে। লীগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক অবরোধ যাতে ইতালীর বিরুদ্ধে কার্যকরী না হয় এজন্য ব্রিটেনের চাপে তৈল বা পেট্রলকে নিষিদ্ধ বস্তুর তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। এইভাবে ব্রিটেন তোষণ নীতির দ্বারা অক্ষশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধাকে বাড়ায়। ব্রিটেনের আশা ছিল যে, এর ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা পাবে। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীঃ ব্রিটেনের নীতির ভ্রান্ত দিক প্রকট হয়ে ওঠে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা

ফ্যাসিষ্ট ইতালীর আগ্রাসন নীতি এবং পূর্ব এশিয়ায় জাপানের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিশ্বশান্তিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। ইতালীর দ্বারা আবিসিনীয়া আক্রমণ, স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ এবং আলবেনিয়া অধিকার আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে। জাপান কর্তৃক ১৯৩১ খ্রীঃ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৬ খ্রীঃ দ্বিতীয়বার চীন আক্রমণ এশিয়ার শান্তিকে ধ্বংস করে। এই দেশগুলির আগ্রাসনের পথ ধরে নাৎসী জার্মানী ব্যাপক আকারে আগ্রাসন আরম্ভ করে। জাপান, জার্মানী ও ইতালী অক্ষশক্তি জোট গড়ে পরস্পরের সহায়তায় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চালায়। অক্ষশক্তির তিন সদস্যই ছিল ১৯১৯ এর শান্তি চুক্তির প্রতি বিক্ষুব্ধ। অক্ষশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যই ছিল বিশ্বের শক্তিসাম্যকে ভেঙে এই তিন শক্তির অনুকূলে আনার ব্যবস্থা করা। রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি গঠিত হলে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

ইতালী ও জাপানের আগ্রাসন নীতি

ইওরোপের দুই শিবিরে বিভক্তি

সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসী আগ্রাসনের ফলে ইওরোপে দারুণ অনিশ্চয়তা লক্ষ্য করে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা দ্বারা ১৯৩৩-৩৮ খ্রীঃ নাৎসী আক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত নেতারা ১৯১৯ খ্রীঃ বিশ্ব বিপ্লবের যে হুমকি দেন তা বুর্জোয়াপন্থী দেশগুলির ভীতি সৃষ্টি করে। এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সোভিয়েত সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ১৯৩৯ খ্রীঃ পোল্যান্ড উপলক্ষে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হলে ইংলন্ড সোভিয়েত সহযোগিতা লাভের জন্যে চেষ্টা করে। কিন্তু ইংলন্ডের প্রস্তাবের আন্তরিকতায় সন্দিহান হয়ে রুশ নেতারা নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব নাৎসী জার্মানীকে আগ্রাসন নীতি গ্রহণে সুযোগ দেয়। জার্মানীর বিরুদ্ধে জোট গঠনের ব্যর্থতার জন্যে পশ্চিমী রাজনীতিজ্ঞরা প্রধানতঃ দায়ী হলেও,

সোভিয়েত নীতির বিফলতা, রুশ-জার্মান চুক্তি

সোভিয়েত নেতারাও দায়ী ছিলেন। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা হিটলার রাশিয়া থেকে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে 'একের পর এক' নীতি (One by One policy) অনুসরণ করেন। যদি সোভিয়েত নেতারা ১৯৩৯ খ্রীঃ একটু ধৈর্য দেখাতেন তবে ১৯৩৯ খ্রীঃ গ্রান্ড এ্যালায়েন্স বা জার্মানীর বিরুদ্ধে মহাজোট গড়া যেত। যদি ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করতেন তবে রুশ নেতাদের আস্থা বাড়ত।

আসলে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিগুলি নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যকে বৃদ্ধি করে বিশ্বে তাদের নিজ নিজ আধিপত্য রক্ষা করে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা উপনিবেশের বাজার থেকে মুনাফা লুঠতে ব্যস্ত থাকে। জার্মানীর ন্যায় একটি শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জাতি ভার্সাই সন্ধির নাগপাশে বাঁধা থাকবে এই আশা ছিল অবাস্তব। সুতরাং জার্মানীর শক্তি বাড়লে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্য ও উপনিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। জার্মানী আপাততঃ ভার্সাই সন্ধি ভেঙে পূর্ব ইওরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নেয়। জার্মানীর এই কাজও ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সন্দেহের উদ্রেক করে। এদিকে জাপান দেখে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটন চুক্তির দ্বারা (১৯২১ খ্রীঃ) চীনে তার ২১ দফা দাবীকে নস্যাৎ করে চীনে মার্কিন বাণিজ্য কায়েম করছে। ব্রিটেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার অবাধ বাণিজ্য চালাচ্ছে। জাপানের ন্যায় শিল্পে সমৃদ্ধ এবং সামরিক জাতি এটা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে জাপান সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নীতি নেয়। এই কারণে বিশ্বযুদ্ধ বাধে। এই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে প্রতিহত করার মত শক্তি জাতিসঙ্ঘ বা লীগ অব নেশনসের ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধের সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ বিশ্বযুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি পার্লামেন্টারী শাসনে আস্থাশীল ছিল। কিন্তু তাদের অর্থনীতি ছিল বুর্জোয়া ঘেঁসা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কার দ্বারা ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করার তারা পক্ষপাতী ছিল না। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল মার্কসীয়-লেনিনীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। মালিকের মুনাফা ও সম্পত্তির অধিকারে তারা বিশ্বাস করত না। এজন্য পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর ক্ষিপ্ত। অপরদিকে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট আদর্শ অনুসারে একদলীয় একনায়কতন্ত্রই ছিল শ্রেষ্ঠ। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে তারা ঘৃণা করত। এদিকে ইওরোপের বাইরে, ভারতবর্ষে, চীনে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিশ্ব অনেকগুলি আদর্শগত শিবিরে বিভক্ত হয়।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র

উপসংহারে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ তীব্র। প্রধান মতগুলি হল সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ (১) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ লুকিয়েছিল। জার্মানী এই সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলে বিরোধ ও যুদ্ধ দেখা দেয়। এ· জে· পি· টেইলারের মতে, জার্মানীর ন্যায্য দাবীগুলি পূরণ করে জার্মানীকে ১৯১৮ খ্রীঃ মার্চের সীমান্ত ফিরিয়ে দিলে হিটলার সন্তুষ্ট হতেন। (২) অপর একটি মত হল যে, চেম্বারলেইনের জার্মান তোষণ নীতিই আসলে যুদ্ধের জন্যে দায়ী ছিল। যদি ১৯৩৯ খ্রীঃ ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানীকে বাধা দিত তবে হিটলার দমে যেতেন। (৩) এ· জে· পি· টেইলারের মতে, হিটলার ইওরোপে প্রভুত্ব চাননি। তাঁর অনেকগুলি দাবী ছিল ন্যায্য। (৪) চতুর্থ একটি মত হল যে, যদি ব্রিটেন ও ফ্রান্স কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে দূরে না রেখে মিত্র হিসেবে নিতেন তবে ত্রিশক্তি আঁতাতের চাপে হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নামার সাহস পেতেন না। (৫) তবে বেশীরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, হিটলারই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে দায়ী। উপরোক্ত সকল কারণগুলির সমন্বয়েই বিশ্বযুদ্ধ ঘটে।